চর্চিকা

(সনৎ ঠাকুর সিরিজ)

সুপর্ণা নাথ

Charchika

Collection of Novelette
by Suparna Nath

© Suparna Nath

ISBN: 978-81-960167-4-6

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ : সুমন্ত গুহ
বর্ণশুদ্ধি : বৈশাখী পাঠক

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিশার্স
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫

মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ₹ 250/-

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূচিপত্র

পাষাণময়ী • ৭

নশ্বর কৃত্য • ২১

চর্চিকা • ৫১

পাষাণময়ী

লেখকের জীবনে সুখ কম, স্বাচ্ছন্দ্য তো আরও কম। তবে আমার মতো ঝাড়া হাত-পা মানুষের একটা পেট; ছাত্র পড়িয়ে আর আমার দূরদর্শী বাবার ব্যাংকে জমানো আমানতের সুদে দিব্যি চলে যায়। বাবা বোধহয় বুঝেইছিলেন, তাঁর সুপুত্র খুব একটা করেকম্মে খেতে পারবে না। তবে আমার ঠাম্মা বলতেন "কাঞ্চন দাসের হাটে দাদুভাই না হয় আমার কলমদাসই হল, ক্ষতি কি?"

ঠাকুরদার বাবার, চুঁচুড়া চন্দননগরের মাঝামাঝি অখ্যাত ভৈরবপুরে বানানো গঙ্গা ঘেঁষা এই শরিকি বাড়ির ছাদটা আছে মাথার ওপর, আর কীই-বা চাই একটা জীবন বাঁচতে! একশো বছর আগে ভৈরবপুরের যেটুকু জেল্লা ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাগর্ভের মতো তাতেও পলি জমেছে। মানুষজন জীবন-জীবিকার টানে ক্রমে শহরমুখী হওয়ার ফলে ভৈরবপুর অতীতের সম্পন্ন জনপদের কঙ্কাল আর আমার মতো কিছু "করে কম্মে না খেতে পাওয়া" অতীত আঁকড়ে থাকা জ্যান্ত প্রেতদের সম্বল করে টিকে আছে।

লেখাটা অনেকটা আমার মনের খিদে। ওই যে পরিচিতির লোভ। মনে হয় যেদিন ফুরিয়ে যাব সেদিন এই লেখাগুলোই কোথাও না কোথাও থেকে গিয়ে

আমাকে হারিয়ে যেতে দেবে না। কিন্তু ওই যে লেখকের জীবনে সুখ নেই বললাম। প্লট খুঁজতে আর জীবনের গল্প থেকে রসদ খুঁজে বের করতে বেশ খাটনি।

মাঝে মাঝে মগজ উত্তর দিয়ে দিলে গঙ্গার এই ভাঙা ঘাটটায় এসে বসি। এদিকে মানুষজন কম, শান্তি পাই। দু'চারদিন যাবৎ দেখছি একজন ভবঘুরে ধরনের মানুষ এখানে ডেরা করেছে।

পোশাক সাধারণ বা বলা ভালো একটু মলিনই। কাঁধে একটা পুরোনো শান্তিনিকেতনি ঝোলা। পায়ে সস্তার রাবারের চপ্পল। ঈষৎ এলোমেলো সাদা-কাঁচা চুল। কারোর সঙ্গে কখনও কথা বলতে দেখিনি বা কোনো সাহায্য বা ভিক্ষা কোনোটাই চাইতেও দেখিনি।

নিজের মতো চুপচাপ জলের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে বসে থাকেন। তবে ওই মলিন মুখ খানায় চোখ দুটো যেন অদ্ভুত উজ্জ্বল। ও চোখের চাহনির দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না যেন মনের ভিতর পর্যন্ত পড়ে ফেলে। মাঝেমধ্যে বার কয়েক চোখাচোখি হয়েছে। দু'তিন দিন এমনি চোখাচোখির পর সেদিন হঠাৎ নিজেই আমার উদ্দেশ্য বললেন,

"একটু আগুন হবে?"

"কী! ...ওহ... হ্যাঁ..."

বলে দেশলাই বাক্সটা বাড়িয়ে দিলাম।

বিড়িটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বাক্সটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন,

"মনে এত প্রশ্ন পুষে রাখতে নেই, উগরে দিন, শান্তি পাবেন।"

খানিক হক চকিয়ে গেলাম, দুটো কারণে এক বাচনভঙ্গীর স্পষ্টতা ও কণ্ঠস্বরের গভীরতা। মানুষের উচ্চারণ বা বাচনভঙ্গি শুনে তার সম্পর্কে বেশ কিছুটা আঁচ করা যায়। লোকটাকে দেখে এমন কণ্ঠ আর ভাষার পরিচ্ছন্নতা হয়তো আশা করিনি। মনে মনে নিজের কাছেই লজ্জিত হলাম, প্রচ্ছদ দিয়ে কখনও বইয়ের সারবত্তা বা মান বিচার্য নয় সেই ইংরেজি প্রবাদটা মনে পড়ে গেল।

ভাব জমাতে দেরি হল না। নাম বললেন,

সনৎ ঠাকুর।

নশ্বর কৃত্য

“রুদ্র বাড়ি আছো নাকি হে?”

গত পাঁচ মাসে এই কণ্ঠস্বরটি আমি কেন আমার বাড়ির শরিক এমনকি আমার ছাত্রদেরও চেনা হয়ে গেছে। ঠাকুর কখন কীভাবে যে এতটা আত্মিক হয়ে গেছেন কে জানে। মাঝেমধ্যেই কোথায় চলে যান, তখন বেশ ফাঁকা লাগে। বুঝি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। টানটা এখন আর শুধু গল্পের প্লটকেন্দ্রিক একদমই নেই।

শেষ কার্তিকের ঠান্ডাটা আমাকে কিছুটা কাবু করেছে বটে, হালকা জ্বরের জন্য দিন কয়েক বাড়ির বাইরে বেরোইনি।

হাসি মুখে বেরিয়ে এসে বললাম,

“আরে আসুন আসুন, একটু বসুন ছাত্রদের আর একটু পরই ছুটি। আসছি আমি বসুন।”

“বসব না এখন, এই নাও ধরো তো...”

একটা ছোটো শিশি দিলেন হাতে,

“চারটে বড়ি দিনে তিন বার, হালকা গরম জল দিয়ে খেলে ভালো...মনে করে খেও কিন্তু।”

অবাক হয়ে বললাম,

“ও এ তো দেখছি হোমিওপ্যাথি ওষুধ, আমি ভাবলাম কোনও ঠাকুরের ফুল বা বিভূতি হয়তো…!”

“হা হা হা…চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেও একটা বস্তু হয় আর সেটা ফুল, বিভূতির থেকে অনেক বেশি কার্যকরও বটে, জাগগে মনে করে খেয়ে নিও, আমি বিকেলে খবর নিয়ে যাব।”

উনি বেরোতে উদ্যত হলেন, আমি পিছু ডেকে বললাম,

“কিন্তু আপনি জানলেন কী করে যে আমার জ্বর…”

কথাটা শেষ করতে পারলাম না উনি মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু অদ্ভুত হাসলেন। যাওয়ার আগে একটু থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন তারপর বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম সেদিকে তাকিয়ে। এই নিয়ে তিন বার! উনি কী সত্যিই সব বুঝতে পারেন নিজেই? সব অব্যক্তই কী ওঁর কাছে বাঙ্ময়!

সেদিন বিকেলে আমার পড়ানো ছিল না, দুপুর থেকেই ঠাকুরের পথ চেয়ে বসে আছি। দু’পুরিয়া ওষুধেই বেশ চাঙ্গা বোধ করছি। সাড়ে চারটে নাগাদ রোদটা একটু পড়ে আসতেই মেইন দরজার শব্দে বুঝলাম ঠাকুর আসছেন।

“রুদ্র আছো নাকি হে…”

বলে চিরাচরিত হাঁক পেড়েই ভিতর উঠোনে পা দিলেন সনৎ ঠাকুর।

হাতে একটা মাঝারি সাইজের ঠোঙা। দোতলার বারান্দা থেকে মুখ ঝুকিয়ে বললুম,

“আপনি আবার এসব কী আনলেন?”

“দাঁড়াও দাঁড়াও উপরে তো আসতে দাও…”

আমি চায়ের জল চাপালুম। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেলাম। ঠাকুর ওপরে উঠে আসছেন।

“এই নাও ঘাটের পাশের দোকানটায় গরম ভাজছিল, নিয়ে এলুম, তোমার জ্বরের জিভে ভালো লাগবে।”

খুলে দেখলাম খান ছয় সাত সিঙ্গারা। একটু লজ্জিত হয়েই বললাম,

“আপনি এসব আবার… কেন ঠাকুর?”

“হা হা হা… আহা ওতে তো আমিও ভাগ বসাব।”

চায়ের কাপ আর সিঙ্গারা একটা পাত্রে গুছিয়ে নিয়ে বাইরের ঘরের চৌকিতে গুছিয়ে বসলাম। শুরু হল নানা বিষয় গল্প। একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম ঠাকুর বারবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে আমার অংশের (বাড়ির) উলটো দিকের পিসিমণির ঘরগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন।

এ বাড়িটা দোতলা। বাইরের উঠোন পেরিয়ে ভিতর বাড়ি। বাড়ির মাঝে একটি বড়ো সান বাধানো উঠোন আর সেই উঠোনের তিনদিকে ঘিরে বাড়িটা। নীচের তলায় আমার দুই জ্যাঠতুতো দাদার অংশ। একজনকে অংশ তালা বন্ধ। তারা কলকাতায় থাকে। আর একজনের অংশে ভাড়াটে থাকে।

উপরের তলায় আমি আর পিসিমণি (বাবার খুড়তুতো বোন)। পিসিমণির ব্যারাকপুরে বাড়ি। পিসেমশাই রেলে ছিলেন গত বছর অবসর নিয়েছেন। ঝাড়া হাত পা জীবন। মাঝেমধ্যে আসেন কয়েকদিন থেকে সাফ সুফ করে আবার চলে যান। কালই পিসিমণি আর পিসেমশাই এসেছেন।

কথার মাঝে বারবার আনমনা হতে দেখে বললাম,

“ঠাকুর, কী হয়েছে বলুন তো?”

উনি একটু আনমনা হয়ে বললেন,

“উম...না কিছু না, সামনের ঘরের দিদি আছেন কি?”

“পিসিমণি? কালই এসেছেন তো, কেন কী হয়েছে?”

“নাহঃ কিছু না...”

কথাটা বলেই যেন সাড়ে ফিরলেন ঠাকুর আর বিষয়টা ঘোরানোর জন্যই বোধহয় হালকা হেসে বললেন,

“এখন কিছু বললে তা খাড়া করতে যে পরিমাণ যুক্তি দরকার তা যে আমার কাছে নেই...”

কথাটা বলেই উঠে বেসিনে হাতটা ধুয়ে আমার মাথায় হাত রেখে কী যেন বিড় বিড় করলেন।

“কী... কী হয়েছে?”

“কিছু না...আর কিছু যাতে না হয় তার জন্যই...ঈশ্বর করুন আমি যেন ভুল প্রমাণিত হই। ও বাদ দাও তুমি। তবে কোনো দরকার বোধ করলে খবর দিও।”

এই কয় মাসে ঠাকুরকে ভালোই চিনে গেছি। তাই ওঁর হঠাৎ এ জাতীয় ব্যবহারে অবাক হই না আর। আর এটাও জানি ওঁর প্রতিটা কথা বা কার্যের পিছনে অবশ্যম্ভাবীভাবে কিছু কারণ থাকবেই। তবে এটাও জানি ঠাকুর থাকলে চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুর পুনরায় চা সিঙ্গারায় মন দিয়েছেন। আগে আগে ওঁর এমন কথায় বেশ অবাক হতাম এখন হই না, আগেই বললাম কিন্তু ভবিষ্যৎ যে এতটা চমক জমিয়ে রেখেছে তার গর্ভে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

***

দিন চার পাঁচ কেটেছে, ঠাকুরের দেওয়া হোমিও ওষুধে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি। কিন্তু এই কয়দিন বাইরে তেমন যাওয়া হয়নি। আসলে পিসিমণি যখন এ বাড়িতে আসেন আর যে কয়দিন থাকেন আমি মায়ের মতো শাসন আর আদর দুটোই খুব উপভোগ করি। এক প্রকার পিসিমণির বারণেই বাইরে যাওয়া হয়নি। তবে আজ অনুমতি পেয়েছি।

দুপুরের দিকে ঘাটে গিয়ে দেখলাম সেই নির্দিষ্ট জায়গায় ঠাকুর বসে আছেন। পাশটায় গিয়ে বসলাম। অন্য দিন একমুখ হাসি নিয়ে স্বাগত জানান কিন্তু আজ ওঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

"কিছু হয়েছে ঠাকুর, চিন্তিত দেখাচ্ছে?"

"না হে, হয়নি তবে বোধহয় হবে...মঙ্গলময় রক্ষা করুন।"

চিন্তামিশ্রিত উদাস কণ্ঠে বলা কথাগুলো অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে গেলেন সনৎ ঠাকুর। আমার মনে একটু খটকা লাগল।

সেদিন বেশি কথা হল না। শুধু বললেন,

"চোখ কান আর অন্তরাত্মা খোলা রাখবে। চোখ আর কানের বাইরেও একটা অনুভবের পৃথিবী আছে। যাকে তোমরা বলো Gut feeling, instinct সেটাকে অগ্রাহ্য করবে না।"

মনের খটকাটা আরও গাঢ় রং ধরছে।

আমি উঠে চলে আসার আগে একটা কাগজ হাতে গুঁজে দিলেন, একটা নম্বর।

“কার নম্বর?”

“আমার। দরকারে ফোন করো।”

মারাত্মক অবাক হয়ে বললাম,

“আপনার ফোনও আছে! আপনাকে দেখে...”

গঙ্গার ঢেউয়ে চোখ রেখে স্তিমিত স্বরে মাঝ পথে আমাকে থামিয়ে বললেন,

“সে তোমার অনুমান ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।”

“না মানে সেটা না, আপনিই তো বললেন সংসারের মায়া ত্যাগ করেছেন...”

“হুম করেছি কিন্তু সংসার হয়তো এখনও আমায় ত্যাজ্য করেনি।”

কথা না বাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

বাড়ি ফিরে পিসিমণির কাছে খবর পেলাম গুড্ডির শ্বশুরমশাই গত হয়েছেন। হার্ট অ্যাটাক্ট। গুড্ডি পিসিমণির মেয়ে আমার বোন। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। বাগবাজারে শ্বশুরবাড়ি। গুড্ডির সঙ্গে আর সৌম্য মানে গুড্ডির স্বামীর সঙ্গে কথা হল।

পিসেমশাইয়ের জ্বর, শরীর ভালো নেই তাই আমি বললাম আজ না হয় আমিই যাচ্ছি। তোমরা কাল যেও। গুড্ডি, সৌম্যও তাতে মত দিল। বেরোতে একটু দেরি হল। যেতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগে সন্ধের সময় জ্যামজটও বেশ ভালোরকমের থাকে। গুড্ডিকে ফোনে জানিয়ে দিলাম একটু দেরি হবে। পৌঁছোতে সাড়ে আটটা বাজল।

গুড্ডির শ্বশুরবাড়িটাও বেশ বনেদি আর পুরোনো। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা, সাবেক কালের বিশাল কাঠের দরজার পাল্লা দুটো ভেজানো। একটু অবাক হলাম এই অবস্থায় বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই যাতায়াত করছে কিন্তু দরজা বন্ধ কেন। বাড়ির সামনের রাস্তায় আলোটা বোধহয় খারাপ। আধো অন্ধকারের অর্ধস্বচ্ছ পর্দা যেন বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। আশ্চর্যভাবে বাড়ির ভিতরে থেকেও তেমন শব্দ আসছে না। কীরকম একটা অস্বস্তি মনে হচ্ছে। নিজের ভাবনাগুলোকে শাসন করে আমি দরজাটা খোলার জন্য হাত বাড়ানো মাত্রই দরজাটা শব্দ করে আপনিই খুলে যায়, মিথ্যে বলব না ক্ষণিকের জন্য একটু চমকে গেছিলাম। দু’পা পিছিয়ে আসি। একজন লোক ভিতর থেকে

চর্চিকা

হেমন্তের শেষ বিকেলগুলো কেমন যেন মন কেমনিয়া হয়। গঙ্গার জলটা যখন পড়ন্ত সূর্যের সোহাগ মেখে লালাভ হতে থাকে মনটা কেমন যেন উদাস হয় আমার। আজ না, এখন না, বরাবর। হয়তো সেই ছোটোবেলা থেকেই। সাঁঝ বিকেলের মিলনসীমা বা গোধূলি বেলাতে আমার মন বড্ড খারাপ হয়। কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই হয়, কেন জানি না। আসলে জীবনের ব্যস্ততায় আর অভ্যাসে মনের ভিতর ঘরগুলো তো ঠিক করে ঘুরেই দেখা হয় না। তথাকথিত ভালো থাকার কারণগুলো জীবনে ঠিকঠাক সাজানো থাকলে মন খারাপ আবার কী! আর কেনই বা? আসলে প্রথাগত বাঁধাধরা কারণের বাইরেও যে মন খারাপ হয় বা হতে পারে এটা আমরা নিজের কাছেই স্বীকার করতে পারি না বা হয়তো চাই না।

আজকের মন খারাপের একটা লাগসই কারণ অবশ্য খুঁজে পেয়েছি, আমার আসলে মন কেমন করছে। সনৎ ঠাকুরের জন্য। গত পাঁচ মাস যাবৎ ওঁর কোনও খোঁজই নেই। মাঝে অবশ্য বার দুই নিজেই ফোন করেছিলেন। ব্যাস এটুকুই। ওঁকে ফোন করলে প্রায় সবসময়ই ফোন সুইচ অফ বলে। প্রথম প্রথম অবাক হয়েছি, পরে বুঝেছি ওঁর মতো ছাঁচ ভাঙা মানুষের কাছ থেকে লৌকিক নিয়মের ছাঁচে ফেলা ব্যবহার আশা করা ভুল। তবে মানুষ তো অভ্যাসের দাস।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সম্পর্কের মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়তে ভালোবাসি বা বলা ভালো অভ্যস্ত। কিন্তু ঠাকুর তো আমার মতো না, উনি স্নেহ ভালোবাসায় অন্যকে বাঁধতে পারলেও নিজে বাঁধা পড়েন না। আসলে অভ্যাস, আমি হয়তো অল্প সময়েই সনৎ ঠাকুরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বিভিন্ন অজানা বিষয় আলোচনা। ওঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতাগুলো শোনা, আর সব থেকে বেশি ওঁর আন্তরিক অসম বয়সি বন্ধুত্ব, এসবেই বড্ড অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর তাই হয়তো ওঁর অনুপস্থিতি এতটা মনকে বিকল করছে। একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে মনে মনে বিড় বিড় করলাম

"সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।"

এই তো গতবছর নভেম্বরে পিসিমণির মেয়ে গুড্ডির বাড়ির বিষয়টা হল। নশ্বর কৃত্য কথাটা ঠাকুরের কাছেই প্রথম শুনেছিলাম তখন। তাও প্রায় বছর ঘুরতে চলল।

"তোর মন খারাপ? নাহ খুনের সম্পর্কের কারুর জন্য না। তোর জীবনে কেউ একজন আছে, তার জন্য? তোর বাপ তোর জন্য সব গুছিয়ে গেছে, তোর ছাত্ররাও তোকে ভালোবাসে পরন্তু তুই খুশ না!"

আচমকা কর্কশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিজাতীয় বাংলা উচ্চারণে রীতিমতো চমকে উঠলাম। গাছের ছায়ার জন্য ঘাটের এদিকটা গোধূলিতেই সন্ধের আঁধার মাখা। চোখ সইয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে শব্দ উৎপাদনকারীকে দেখার ও চেনার চেষ্টা করলাম। আমাকে বেশি খাটতে হল না। সে নিজেই এগিয়ে এল আমার কাছে, সামনে যাকে দেখলাম তার উচ্চতা মাঝারি, মাথার ওপর মাথার থেকে প্রায় দ্বিগুণ আকারের জটাজুট। পরনে কালো ধুতি আর চাদর। গলায় প্রচুর পরিমাণে রুদ্রাক্ষ আরও নানাবিধ পুঁতির মালা। কাঁধে কালো কাপড়ের পোটলা। হাতে একটা ছোট্ট ত্রিশূল। মুখ ও দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা আর কপালের ফাঁকটুকু পূরণ করেছে দু'টাকার কয়েনের সাইজের একটি কালো টিপ।

"আপনি আমাকে কিছু বলছেন?"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

"হাঁ, তোকেই, ইধার আয়।"

আমি খানিক কৌতূহলবশতই লোকটির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

“বলুন?”

“মন অশান্ত আছে? কেন আছে? তোর তো আগে পিছে কেউ নেই। চিন্তা কাহে কা? উসকা সায়া তো এক সাল আগেই সরে গেছে।”

দৃঢ় কণ্ঠে এবং উচ্চ গ্রামে কথাগুলো বললেন সামনের ব্যক্তিটি।

“কে আপনি এসব...এসব কি বলছেন?”

“হামি সর্বজ্ঞ, তোর ছোটোবেলায় একবার তুই মরতে মরতে বেঁচেছিলি, তোর মা শিউজির কাছে বলেছিল যে তুই বেঁচে গেলে উনি সারা জিউয়ান আম খাবেন না। কি তাই তো?”

এবার সত্যি অবাক হই। আমার মা সত্যি আম খেতেন না। ঠাম্মা বলেছিলেন বটে যে মায়ের প্রিয় ফল মা ত্যাগ করেছিলেন আমার জন্য। কী নাকি মানত ছিল। কিন্তু সে-কথা তো আমরা ছাড়া কেউ জানত না। মা কাউকেই কারণটা বলতেন না।

আমার চিন্তার মাঝেই কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল,

“তবে তোর সামনে সময়টা আচ্ছা না আছে...।”

ঘটনার আকস্মিকতায় হোক বা মনের খানিক বিকল অবস্থার জন্যই হোক এতক্ষণ লোকটির কথাগুলো শুনে একটু অবাক ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,

“আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বুঝে নেব...আপনি আসুন এবার।”

কথাটা বলেই লোকটিকে পাস কাটিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম।

“তোর বাঁয় জেবে একটা ৫০০ রূপিয়ার নোট আছে আর ডান জেবে দুটো ২০০-র নোট আর একটা কাগজ এর চিরকুট।”

আমার পা দুটো অবাধ্যের মতো আপনিই দাঁড়িয়ে গেল। চূড়ান্ত অবাক হয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম,

“কি...কী করে...”

গর্ব আর অহংকার মেশানো হাসি হেসে বলল,

“কহে থে না আমি সর্বজ্ঞ আছি। শুন তোর সামনে বড়ো ফাঁড়া আসছে, এটা কেটে গেলে তুই রাজা হবি বেটা, এদিকে আয় দেখি তোর লালাট মে কি লিখা আছে।”

"আমি বাধ্য বাচ্চার মতো ওঁর দিকে এগিয়ে গেলাম"

আঁধার আরও এক পোঁচ গভীর হয়েছে। লোকটার মুখটা স্পষ্ট না তবে চোখটা আর ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতগুলো বেশ উজ্জ্বল। এই আধা আঁধারেও যেন ঝিলিক দিচ্ছে। লোকটা পোটলায় কি যেন হাতরাচ্ছে, একটা ছোট্ট কৌটো বের করে তার থেকে কাজলের মতো কিছু আঙুলে তুলে নিয়ে সেটা নিয়ে আমার কপালের দিকে হাত বাড়াল,

"আজা বেটা দেখি তোর ললাট কী বলছে...দেখি তোর বিপদ..."

"তুই নিজের ললাট সামলা হরিপ্রাসাদ, আমার কিন্তু বশীকরণ কাজলের ডিবেরও দরকার হবে না..."

লোকটার কথার মাঝেই জলদ গম্ভীর স্বরে কেউ কথাগুলো বলে ওঠাতে লোকটি বেশ চমকে আর থতোমতো খেয়ে থেমে গেল আর আমারও চমক ভাঙল।

যিনি কথাগুলো বলছেন তিনি আমার পিছনে আছেন আর তার মুখের ওপর জটাধারী লোকটির অবাক দৃষ্টি নিবদ্ধ। স্বরটা আমার খুব চেনা...

"ঠাকুর...!"

বলেই পিছন ঘুরে দেখি, ঠিক...আমি একদম ঠিক, এ স্বর আমার ভোলার নয়।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম সেই সুযোগ না দিয়েই ঠাকুর লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন,

"তো সর্বজ্ঞ হরিপ্রসাদ জি, এবার আমি বলি.... নিবাস বিহারের ছাপড়া জেলার সীতাপুর, টুক টাক হাত সাফাই করতিস, গ্রামে এক সাধু এল তার সঙ্গে ঝুলে পড়ে কলকাতা সেখান থেকে তারাপীঠ। গুরু তোর ভালোই জুটেছিল, শিখলি ও কিছু কিন্তু অপরাধ তোর শিরায়, লোক ঠকাতে বেশি মন, গুরু খেদিয়ে দিল।"

লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে হাতের ত্রিশূল নিয়ে অভিশাপ দেওয়ার ভঙ্গিতে ঠাকুরকে কিছু বলতে যেতে উদ্যত হতেই ঠাকুর আবার বললেন,

"ওই সাড়ে চারশো টাকার এনামেলের ত্রিশূল নিয়ে বেশি লাফাস না, ভেঙে যাবে। আর হ্যাঁ তোর ঝোলায় ওই উল্লু পালক পোড়ার কাজল তার পর শ্মশান

থেকে চুরি করা খপ্পর, হাজার বিশেক টাকা দুটো মোবাইল ফোন সিগারেট লাইটার আর ওই দুটো বিলাতি ছবির ম্যাগাজিন ছাড়াও একটা ভোজালি আছে।

আর এই ভোজালি নিয়ে ঘোরার ব্যাপারটা ওই যে সামনের মোড়ের ট্রাফিক পুলিশকে জানাতে পারলে বাকি খাতিরদারী ওঁরাই করে দেবেন, কি হরি প্রসাদ? বলব?”

এতক্ষণে রাস্তার কম পাওয়ারের হলুদ আলোটা জ্বলে উঠেছে। হরিপ্রসাদের চঞ্চল লালচে চোখের চাহনি আর কপালের চিক চিকে ঘামের কুচি বলে দিচ্ছে সে মারাত্মকভাবে ভয় পেয়েছে। কিন্তু তার চোখের ভাষায় শুধু ভয় না আরও কিছু একটা ছিল সে যেন কিছু একটা ঠাওর করতে চেষ্টা করছে, হঠাৎ তার কুঞ্চিত ভ্রূ যুগল টান টান সোজা হয়ে খানিক উপরের দিকে উঠে গেল আর তার বিস্মিত বিস্ফারিত চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে যা সে ঠাওর করতে চাইছিল তা সে পেরেছে।

ভূত দেখার মতো আতঙ্কিত চোখে...

“ভৈরো...সমশান ভৈরো... জীসম এক যান দো!”

কথাটা বিড়বিড় করতে করতে পিছু হটতে থাকে হরিপ্রসাদ। কিছুটা দূরে গিয়ে পিছন ফিরে দৌড় লাগায়, একবার শুধু যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে “বাচকে রেহেনা...” বলতে বলতে গলির বাঁকে হারিয়ে যায় হরিপ্রসাদ।

কথাটার মধ্যে ধমকি বা হুমকি ছিল না মোটেই যেটা ছিল তা হল চাপা আতঙ্ক!

পুরো বিষয়টা কোথা দিয়ে যে কী ঘটে গেল সেটা আত্মস্থ করতেই মিনিট খানেক লেগে গেল আমার। ধাতস্থ হয়ে দেখি ঠাকুর মিটিমিটি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি মুখ খোলার আগেই বললেন,

“হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি অনেক প্রশ্ন জমেছে মনে, সব হবে আগে বাড়ি যাও দেখি। অনেক গপ্পো আছে, অনেক গল্পের প্লট পাবে।”

কথাটা বলে চোখ টিপে হাসলেন। এতক্ষণে ওঁর দিকে ভালো করে লক্ষ করলাম। খুব উশকোখুশকো আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

“আমি যাব মানে? আপনি আসবেন না এখন... চলুন এখুনি, কি চেহারা

করেছেন?”

“হাহাহা, যাব যাব... বলেছিলাম না আমার বোধগুলো ঘাট পেয়েছে এতদিনে তা তোমায় যদি সবটুকু নাই বলতে পারি আমার তো মুক্তি নেই যে।”

***

বাড়ি এসেই চা এর জোগাড়ে লেগেছি। মোড়ের মাথার দোকান থেকে বেশ কিছু কচুরিও নিয়ে এসেছি। এখন শুধু ঠাকুর আসার অপেক্ষা।

রান্নাঘর থেকে শুনতে পেলাম নীচে আমার নাম নিয়ে কেউ কিছু বলছে, কে আবার এল! বারান্দা দিয়ে মুখ ঝুলিয়ে যাকে দেখলাম তাকে দেখার কথা মাথাতেও ছিল না। আশ্চর্যান্বিত আনন্দ বলে অভিধানে কোনও শব্দ আছে কিনা জানি না, আমার অবস্থা এখন ওটাই। সমর এসেছে, সমর পাল।

“আরে! সমর কতদিন পর রে! কী ভাগ্য আমার, আয় আয় উপরে আয়।”

সমর আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। মাধ্যমিকে র পরই ওরা এখন থেকে চলে যায়। তারপর আর যোগাযোগ ছিল না। সেসময় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির ঘরে ঘরে ল্যান্ড ফোন ছিল না। আর ইন্টারনেট সোশ্যাল মিডিয়ার নামও মানুষ শোনেনি। হ্যাঁ চিঠিপত্র ছিল অবশ্যই তবে জীবনের ব্যস্ততা বড়ো বালাই।

“রুদ্র, তোদের বাড়িটা কিন্তু একই আছে রে, ভালো মেন্টেন করে রেখেছিস।”

“হুম, পরিবার তো নেই পরিবারের স্মৃতিটুকুই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি সবাই মিলে। তবে তুই যে এত বছর পর চিনে আসতে পেরেছিস, সেটা দেখে অবাক হচ্ছি!”

“চিনব না কি রে! ছোটোবেলায় কত এসেছি তোদের বাড়ি, কাকিমার হাতের রান্না খেয়েছি, খেলেছি, মনে থাকবে না মানে!”

ঠাকুর এখনও এলেন না। ভালোই হয়েছে চা-টা তৈরি আছে। সমরকে চা কচুরি গুছিয়ে দিলাম। পুরোনো দিনের গল্প শুরু হলে থামতে চায় না। জানলাম ওরা নাকি ওদের দেশের বাড়ি মালদাতে চলে গেছিল। ওর বাবা এখানে একটা ছোটো সৌদাগরি অফিসে কাজ করতেন। মালদায় নাকি ওদের বিরাট পৈতৃক

বাড়ি আর ঠাকুরদার জমাটি থান কাপড়ের ব্যবসা ছিল। মালদার নামকরা ধনাঢ্যদের মধ্যে সমরের ঠাকুরদাদা ছিলেন একজন। ওর বাবা দাদুর সঙ্গে মনোমালিন্য করে বাড়ি ছেড়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরদার মৃত্যু শয্যায় উনি সমরের বাবাকে ডেকে পাঠান। আর মিটমাট করে নেন। সমরের বাবা ছিলেন ওঁর একমাত্র বংশধর। সেই থেকে সমর ওখানেই।

"দেখ তোর বাড়ি যে কারণে আসা সেটাই বলা হল না, আমি কলকাতায় একটা বাড়ি আর জমি কিনেছি, আর সেই বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে তোকে আসতেই হবে।"

"বাহ, এত দারুণ খবর, অবশ্যই যাব। তোর মালদার ব্যবসা বাড়ি...সেসব।"

"হুম, এদিকে সেটল করে গেলে ধীরে ধীরে ওগুলো বেচার ব্যবস্থা করব। আসলে ঠাকুরদার থান কাপড়ের ব্যবসার পাশে আমি কার ডিলারশিপ এর ব্যবসা শুরু করি। বুঝিসই তো থান কাপড়ের ওই ব্যবসা এখন তেমন চলেও না। গাড়ির ব্যবসাটা বরাবরই কলকাতাকেন্দ্রিক। বাবা বছর দেড়েক হল গত হয়েছেন, সাডেন হার্ট অ্যাটাক!

"তাই ওদিকের পাট মিটিয়ে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে আসব ঠিক করেছি। আর বাবা ছিল ঠাকুরদার একমাত্র সন্তান আমিও বাবার একই ছেলে, তাই ওই অত বড়ো বাড়িতে এখন থাকাটাও মুশকিল।"

"বাহ, ভালোই হল মাঝেমধ্যে ছুটির দিনে এখানে এসে ঘুরে যাবি।"

"একদম সে আর বলতে।"

আমাদের কথার মাঝেই সেই অতি পরিচিত আর অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত

"কই হে রুদ্র, আছো নাকি..."

ডাক শুনতে পেলাম। বাইরে এসে দেখলাম ঠাকুর সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসছেন, মুখে হাসি আর হাতে বড়োসড়ো একটা ঠোঙা। বেশ অনেকগুলো সিঙ্গারা নিয়ে এসেছেন। আগের অভ্যাস বদলায়নি একটুও।

ঘরে ঢুকেই সমরকে দেখে একটু থমকে গেলেন,

সমরের সঙ্গে আলাপ করালাম ঠাকুরের। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পালা চুকল। ঠাকুরের মুখে হাসি, কিন্তু কি যেন... এই 'কিন্তু'টা ঠিক কী ধরতে পারলাম না

তবে একটা খটকা যেন রয়ে গেল মনে।

দ্বিতীয় প্রস্থ চা এর সঙ্গে গল্প আরও জমাটি হল। সমর, গুড্ডিদের বাড়ির ঘটনা শুনে তো অভিভূত। বলল,

"ঠাকুর আপনাকেও কিন্তু আমার গৃহপূজায় আসতেই হবে। আমার স্ত্রী আর মা খুব খুশি হবেন, প্লিজ আসবেন।"

সমর খানিক পর বিদায় নিল। এবার আমি পাকড়ে ধরলাম ঠাকুরকে। ঘাটের ওই হরিপ্রসাদ এর ব্যাপারটা নিয়ে।

"আচ্ছা ঠাকুর, আমার না অদ্ভুত লাগছে এটা ভেবে যে লোকটা আমার পকেটে কত কি টাকা আছে তা কী করে জানল আর ঠিক তেমনই আপনি ওর ঝোলার খবর পেলেন কী করে?"

"কাকচরিত বা কাক তন্ত্র..."

"অ্যাঁ... কাকেরাও তন্ত্র করে নাকি!"

"হাহাহা... খানিক নিম্ন মানের তন্ত্র, অনেকে মায়াং তন্ত্র বা বিদ্যাও বলেন। গুরুর আদেশ নিয়ে শ্মশানে গাত্র বন্ধন করে, কোনও শনি বা মঙ্গলবার অমাবস্যা তে "ওঁম ক্রং কাঁ কাঁ" মন্ত্রটি দশ হাজার বার জপ করলেই হল। হুম বিশেষ কিছু উপাচার এবং জপাচারও দরকার হয় অবশ্য। কাকতন্ত্রে সিদ্ধ হলে তুমি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তার সম্পর্কে বেশ কিছু প্রাথমিক অনুমান করতে পারবে এমনকি ওই যে পকেটে কী আছে তাও বলতে পারবে, লোকজনকে চমকে দিয়ে টু পাইস ইনকামের সহজ রাস্তা।"

"বাহঃ এ তো দারুণ ব্যাপার...সব জানা যাবে সহজেই।"

"না হে, যা কিছু সহজ লব্ধ জানবে তার ফুটোফাটা অনেক। কাকতন্ত্রের দ্বারা প্রাথমিকভাবে সাম্প্রতিক ভবিষ্যত অতীত হয়তো বলতে পারবে তবে প্রকৃত ভাগ্য দ্রষ্টা হওয়া যায় না।"

"আপনিও তার মানে কাক তন্ত্র জানেন?"

"হ্যাঁ, শুরুর দিকে কৌতূহলের বশে শিখেছিলাম বৈকি। তবে যত ধর্মকে বুঝতে শুরু করলাম, তার সারবত্তা বুঝতে শুরু করলাম তখন বুঝলাম এগুলো কতটা অন্তঃসারশুন্য। কেন জানো? মানুষের ভবিষ্যৎ কিন্তু প্রস্তর খোদিত না, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক ও কর্মফলের সঙ্গে তা পরিবর্তনশীল।"

“হুম কিন্তু আপনি তো ওর সব কিছুই বলে দিলেন, মানে আপনার কাকতন্ত্র লব্ধ জ্ঞান রয়ে গেছে, আপনি না চাইতেও রয়ে গেছে? মানে ওর ত্রিশুলের দামটাও বলে দিলেন!”

“ঠিক বলেছ তুমি, আমরা যা কিছু শিখি সারা জীবন সেটাকে শত চেষ্টা করে ভোলা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবও না। তবে...হাহাহা...”

কথা না শেষ করেই হেসে ফেললেন ঠাকুর,

“কী হল..!”

“না কিছু না...মানে তুমি বললে না যে ত্রিশূল এর দামটাও...ওটার জন্য কোনও তন্ত্রের দরকার হয় না। ওর ত্রিশূলর ফলায় দাম লেখা স্টিকারটা খুলতে ভুলে গেছিল হতভাগা...”

কথাটা শুনে আমিও ঠাকুরের সঙ্গে একচোট হেসে নিলাম।

***

সমরের বাড়িটা ঠিক হার্ট অফ দা সিটিতে না গড়িয়ার ভিতর দিকে। বেশ জমকালো খোলামেলা বিরাট দুধ সাদা বাড়ি। কারুকাজ করা মেন লোহার গেট থেকে সোজা নুড়ি বিছানো পথ চলে গেছে বাড়ির সামনের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত।

আর বাড়ির বাম পাশে আর পিছন দিকে কাঠা পাঁচেক জমি তাতে বিভিন্ন ফুল ফলের গাছ। পুরো জায়গাটাই দেড় মানুষ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির বামপাশের জায়গাটিতে বিশাল প্যান্ডেল। অতিথি অভ্যাগততে বাড়ি সরগরম। সমর আপ্যায়নের ক্রুটি রাখেনি। কাকিমা মানে সমরের মা অনেকদিন পর আমাকে দেখে খুব আনন্দিত। আমার মা বাবার গত হওয়ার খবর শুনে বেশ মুষড়ে পড়লেন। সমরের স্ত্রী ইন্দ্রাণী আর সব থেকে মিষ্টি মানুষ ‘চিনি’...ওর চার বছরের কন্যারত্নটির সঙ্গেও আলাপ হল। এবং চিনি আর তার ভালো কাকুর (মানে আমি, নামটা চিনিরই দেওয়া) বন্ধুত্ব জমতে সময় লাগল না।

সমর নিজে আমাদের বাড়ি আর বাগান ঘুরিয়ে দেখাল। বলল সামনের মাসটি মলমাস পড়ে যাচ্ছে তাই গৃহপ্রবেশটা করে রাখল। তেরাত কাটিয়ে ফিরে আসবে কেননা বাড়ির ইন্টেরিয়রর কাজ নাকি বেশ কিছু বাকি।

সারাদিন হই হই কাটিয়ে সন্ধের আগেই আমরা বিদায় নিলাম পথ

অনেকটা। সমর আমাদের সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে দিতে এল এবং সঙ্গে চিনিও। বিদায় নেওয়ার আগে ঠাকুর চিনিকে কোলে নেওয়ার ছুতোয় ওর মাথায় হাত দিয়ে কি যেন একটু বিড় বিড় করলেন।

বাড়ি ফেরার পথে বিষয়টা জিজ্ঞেস করায় বললেন,

"ছোট্ট মানুষ, বাড়িতে আজ কত লোক সবাই কোলে নিচ্ছে আদর করছে, নজর ইত্যাদি যাতে না লাগে তাই আর কী...। সবাই যে ক্ষতির ইচ্ছায় নজর দেয় তা নয়, কিছু মানুষের নজর দোষ থাকে, তারা তা জানতেও পারে না।"

কেন জানি আমার মনে হল ঠাকুর কিছু লুকোচ্ছেন, কেন তা জানি না।

তবে কারণটা যে এভাবে জানতে হবে ভবিষ্যতে তা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।

***

সেই গঙ্গার ঘাট সেই গোধূলি বেলা। পাশাপাশি ঠাকুর আর আমিও সেই এক শুধু মাঝখানে প্রায় একটি বছর কেটে গেছে আর এই একটি বছরে একটি অপরিচিত অনাত্মীয় ভবঘুরে মানুষ আমার সব থেকে বড়ো ভরসার স্থল হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যান, ভয় করে আবার যদি অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়ি। কিন্তু ওই যে ভরসা, জানি প্রকৃত প্রয়োজনে উনি থাকবেনই। এক দৃষ্টিতে মা গঙ্গার চিরায়ত বহমানতার সঙ্গে চিন্তা স্রোতের তাল মেলাচ্ছি। দুজনেই নির্বাক।

"আর ঐটিই তো গণ্ডগোলের বস্তু..."

দুম করে কথাটা বলে উঠলেন ঠাকুর। আমি কিছু বুঝতে না পেরে বললাম,

"অ্যাঁ...!"

"ওই যে ভরসা...এক্সপেক্টেশন...ওটি বড়ো বিষম বস্তু হে...নাহ ভেবেছিলাম অভিজ্ঞতাগুলো ঘাট পাবে তোমার কলমে, মহাকালের বুঝি সেই ইচ্ছে। এখন দেখছি শেষ বেলায় আবার আমিই না বাঁধা পড়ে যাই।"

কথাটার মধ্যে খোঁচা আর কৌতুক যুগপৎ ছিল, সেটা ভালোই বুঝলাম। গায়ে না মেখে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললাম,

"অ...!"